সাপ্তাহিক সংকলন

রেজিঃ ডিএ ৬০৫৮ | সংখ্যা-১২ | সোমবার, ১৪ মাঘ ১৪২০, ২৫ রবিঃ আউয়াল ১৪৩৫, ২৭ জানুয়ারি ২০১৪ | ১৬ পৃষ্ঠা ৫ টাকা

একতাই বল

ছোট বেলায় পড়ে আসা 'একতাই বল' গল্পটির 'একের বোঝা দশের লাঠি' উপদেশটির প্রয়োজনিয়তা যে কতখানি তা আজ আমরা বুঝতে পারছি। তাই এখন আমাদের পৃথিবীর বুকে একটি শক্তিশালি জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাড়াবার একমাত্র পথ ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

ঐক্যহীনতা 'কুফর' পৃষ্ঠা-৭

তওহীদের আহ্বান পৃষ্ঠা-১০

মানবজাতির ঐক্যই আল্লাহর অভিপ্রায় পৃষ্ঠা-৫

মানবতার কল্যাণে সত্যের প্রকাশ

দৈনিক দেশেরপত্র

১৬ কোটি মানুষের এক শ্লোগান পাল্টে দেবে জীবনধারা

আসুন, আমরা সবাই এই কথাগুলির উপর ঐক্যবদ্ধ হই:

১. আমরা যে যেই দল মত, ধর্ম-বর্ণেরই হই না কেন আমাদের সবারই এক দেশ, আমরা সবাই একই জাতির মানুষ। তাই আমরা আমাদের নিজেদের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে সকল অনৈক্য ভুলে ভাই ভাই হোয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকবো।

২. সমাজের কেউ অন্য কারো উপরে হামলা কোরবে না, কারো ক্ষতি কোরবে না।

৩. কেউ কারও ব্যবসা-বাণিজ্য, চলাফেরায় বিঘ্ন সৃষ্টি কোরবে না।

৪. কেউ কোন প্রকার সন্ত্রাস, হানাহানি বা কোনরূপ আতঙ্ক সৃষ্টি কোরবে না।

আমরা যাবতীয় অন্যায়-অবিচার আর অশান্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোলাম। আজ থেকে আমাদের

শ্লোগান হবে:

"এক জাতি এক দেশ, ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ"

দৈনিক
দেশেরপত্র

মানবতার কল্যাণে সত্যের প্রকাশ

সম্পাদকীয়

এই মুহূর্তে দেশবাসীর একমাত্র করণীয় ঐক্যবদ্ধ হওয়া

ঐক্যই সকল শক্তির মূল। একাত্তর সালে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি পাকিস্তানের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে যখন ঐক্যবদ্ধ হোয়েছিল তখন কোন শক্তিই আমাদেরকে দাবিয়ে রাখতে পারে নি। কিন্তু সেই ঐক্য আমরা ধোরে রাখতে ব্যর্থ হোয়েছি। লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভ করার পর বিগত ৪২ বছরে পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোর ইন্ধনে, প্রকারান্তরে তাদের চাপিয়ে দেওয়া বিভিন্ন মত-পথ-মতবাদের উপর ভিত্তি কোরে শত শত রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। এভাবে আমরা রাজনৈতিকভাবে বহু ভাগে বিভক্ত হোয়ে পড়ি। অপরদিকে ধর্মব্যবসায়ী মোল্লা শ্রেণি ধর্মকে ব্যবহার কোরে স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অসংখ্য দল-মত-তরিকা সৃষ্টি কোরে রেখেছে, তারাও ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত কোরেছে। এই উভয় শ্রেণির রাজনৈতিক বাদ-বিসম্বাদের পরিণামে ৪২ বছরে এই জাতিটি একদিনের জন্যও ঐক্যবদ্ধ হোতে পারে নি, এক দিনের জন্যও এ জাতিকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া হয় নি। আমাদের দেশের ভৌগোলিক সীমানা একটুও বাড়ে নি, কিন্তু আমরা সংখ্যায় এখন হোয়েছি প্রায় ১৬ কোটি। এই অবস্থায় এই দরিদ্র জাতিটির মধ্যে যদি দাঙ্গা, হামলা, ভাঙচুর, অগ্নি-সংযোগ, হরতাল, অবরোধ, ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ কোরে দেওয়া ইত্যাদি চোলতে থাকে তাহোলে আর জাতির অস্তিত্বই থাকবে না। তখন কে কোন দলের কতবড় নেতা, কে কোন দলের অনুসারী এসব হিসাব কোরে কোনো লাভ হবে না। সকলকে মনে রাখতে হবে, যেখানে আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত লোকেরা আক্রান্ত হয়, নিরীহ নারী, শিশু, বৃদ্ধ আক্রান্ত হয় সেখানে আমরা কেউই নিরাপদ নই। তাই এমন একটি অনিরাপদ সমাজে অপরিহার্য হোয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

আমাদের এই অনৈক্য, বিভেদের সুযোগ নিয়ে বৈদেশিক পরাশক্তিগুলো এই ভূখণ্ডের দিকে শ্যেনদৃষ্টি হানছে, তাদের আনাগোনা, অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে অতিমাত্রায় হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য নিয়ে সচেতন দেশপ্রেমিক ব্যক্তিরা চিন্তিত হোয়ে পড়েছেন। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, গণতন্ত্রের চর্চা না থাকা ইত্যাদি নানা ওসিলাকে দাঁড় কোরিয়ে এই পরাশক্তিগুলোর অযাচিত হস্তক্ষেপে সিরিয়ায়, ভিয়েতনামে, লিবিয়ায়, ইরাকে, মিসরে, ফিলিস্তিনে, আফ্রিকার দেশগুলোতে এক কথায় তৃতীয় বিশ্বের মোসলেম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর অবস্থা কী হোয়েছে তা কারও অজানা নয়। এই অবস্থায় এই জাতিকে কয়েকটি কথার উপর এই মুহূর্তে ঐক্যবদ্ধ হোতেই হবে।

১. আমরা যে যে দল মত, ধর্ম-বর্ণই হোই না কেন আমরা এই সমাজের মানুষ সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ থাকবো, আমরা বিশ্বাস কোরব মানুষ হিসাবে আমরা সবাই ভাই ভাই, এক বাবা মা আদম হাওয়ার সন্তান।

২. রাজনীতির নামে সকল প্রকার সহিংসতা, দাঙ্গা, ভাঙচুর, ক্ষতিকর সকল কর্মসূচির বিরুদ্ধে আমরা একমত।

৩. ধর্ম নিয়ে সকল প্রকার ব্যবসা ও অপরাজনীতির বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ।

৪. আমরা কেউ কারো উপরে হামলা কোরব না, কারো ক্ষতি কোরব না, কেউ কারও ব্যবসা-বাণিজ্য, চলাফেরায় বিঘ্ন সৃষ্টি কোরব না।

এক কথায় যা কিছু সত্য ও ন্যায়সঙ্গত, যা কিছু মানবতার কল্যাণে তা গ্রহণ কোরব, আর যা কিছু অন্যায়, অসত্য, মানুষের অকল্যাণ বয়ে আনে তার সবকিছু প্রত্যাখ্যান কোরব। আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ডকুমেন্টারি প্রদর্শন, সেমিনার, মাইকিং, পত্রিকায় প্রবন্ধ, নিবন্ধ প্রকাশ ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি এবং কোন শয়তানী অপশক্তি অপপ্রচার চালিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত কোরে যেন মানবতার কল্যাণে আমাদের গৃহীত এই মহতী উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত কোরতে না পারে সে জন্য সকলের সহযোগিতা আমরা কামনা কোরি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কোরি, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর যে উর্বর মাটি স্রষ্টা আমাদেরকে দিয়েছেন তাই আমাদের সমৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট। আমরা যদি ১৬ কোটি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হোতে পারি আমাদের কোন অভাব থাকবে না, আমাদেরকে অন্য কারও মুখাপেক্ষী হোয়েও থাকতে হবে না। আমরা হবো স্বনির্ভর ও মর্যাদাসম্পন্ন জাতি। কোনও পরাশক্তিকে আমাদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। কে ক্ষমতায় থাকলো আর কে ক্ষমতাচ্যুত হোল ইত্যাদি নিয়ে আপাতত বাদ-বিসম্বাদ না কোরে সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধ হোলে দেশময় শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসবে এনশা'আল্লাহ।

সূচিপত্র

শয়তানী চক্রান্তের বিষফল-ঐক্যহীনতা-৪
মানবজাতির ঐক্যই আল্লাহর অভিপ্রায়-৫
ঐক্যহীনতা 'কুফর'-৭
তওহীদের আহ্বান-১০
বিভিন্ন ধর্মে ঐক্যের গুরুত্ব-১০
যামানার এমামের ব্যক্তিজীবন-১১
সাধারণ মানুষের ঐক্যহীনতার সুযোগ নিচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো-১২
নেতা পরিবর্তনের চাইতে সিস্টেম পরিবর্তন জরুরি-১৩
ঔপনিবেশিক আমল থেকে বর্তমান শিক্ষা একটাই: দরকার জাতীয় ঐক্য-১৪

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: শাহানা পন্নী (রুফায়দাহ)
প্রকাশক : এডভোকেট আমিনুল হক আকবর। সম্পাদক কর্তৃক মিতু প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়: ২২৩, মধ্য বাসাবো (সবুজবাগ থানা সংলগ্ন) সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪।
ফোন: ০২-৭২১৮১১১, ০১৭৭৮২৭৬৭৯৪, বিজ্ঞাপন বিভাগ: ০১৮১৯২৭৮৭৮২, ইমেইল: desherpattro13@yahoo.com

এ তো শয়তানের পা, যার মাঝে বিভেদের দেয়াল, যে কখনো মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ হোতে দেয় না।

শয়তানী চক্রান্তের বিষফল-
ঐক্যহীনতা

আতাহার হোসাইন

আল্লাহ যে সকল নিয়ম দিয়ে তাঁর সৃষ্টিজগৎ পরিচালনা করেন সেগুলো প্রাকৃতিক এবং চিরন্তন, শাশ্বত (Etarnal) নিয়ম। বাহ্যিক চোখে আমরা অনেকে বস্তুর পরিবর্তন হোতে দেখলেও প্রকৃতপক্ষে ঐ নিয়মগুলোর কখনোই কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন আগুনের ধর্ম হোচ্ছে সে সব কিছুকে পুড়িয়ে দেবে। এটা হাজার বছর আগে যেমন সত্য ছিলো তেমনি হাজার বছর পরেও একইরকম থাকবে। আবার পানিকে মুক্ত কোরে দিলে সে নিম্ন ভূমিতে ছড়িয়ে পড়বে- এটাও প্রাকৃতিক নিয়ম। আল্লাহ মানবজাতিকে শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধিতে বসবাস করার জন্য দয়াপরবশ হোয়ে এমনি কতগুলো নিয়ামক দান কোরেছেন। এর মধ্যে মতভেদ না করে ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্ব অপরিসীম। এ জন্য তিনি প্রত্যেক নবী-রসুলের মাধ্যমে পাঠানো জীবনব্যবস্থায় মানুষকে ঐকবদ্ধ থাকার হুকুম দিয়েছেন। তিনি কোর'আনে বলেছেন, "আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো ঐক্যবদ্ধ হোয়ে সংগ্রাম করে (সুরা সওফ-৪)। ঐক্য নষ্ট হয় এমন কোন কথা বা কাজকে রসুলাল্লাহ কুফরের পর্যায়ের গোনাহের সাথে তুলনা কোরেছেন। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কুফরের চেয়ে বড় গোনাহ আর নেই। আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গোনাহ মাফ কোরে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যদি সে কুফর না করে। সাধারণত মতভেদ ও মতভিন্নতা থেকেই অনৈক্যের সূচনা। রসুলাল্লাহ কোর'আনের কোন আয়াত নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করাকে কুফর হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং ঐক্য, শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধির ধারণা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। অপরদিকে অনৈক্য, হিংসা-বিদ্বেষ মানবজাতির এই উন্নতি ও প্রগতির অন্তরায়। একমাত্র এবলিস শয়তানই চায় মানুষ শান্তি ও সমৃদ্ধির পরিবর্তে অনৈক্য, হানাহানি ও হিংসা-বিদ্বেষে ডুবে থাকুক। আর এটা সম্ভব একমাত্র মানুষের জীবনে অনৈক্য ও বিভেদের বিস্তার ঘটিয়ে। সুতরাং অনৈক্যের আগমন শয়তানের কাছ থেকে। মানুষকে অন্যায়-অশান্তিতে ডুবিয়ে রাখার জন্য শয়তানের প্রধান অস্ত্রই হোচ্ছে অনৈক্যের বিস্তার ঘটানো।

অপরদিকে পৃথিবীর বুকে যারা অনৈক্য চায়, অনৈক্যের বিস্তার ঘটায় এরা সরাসরি শয়তানেরই অনুসারী, এরাই প্রকাশ্য শয়তান। তাই যারা ঐক্যের বিরুদ্ধে কথা বলে, যারা চায় মানুষের মধ্যে ঐক্য না আসুক তাদেরকে প্রতিহত করা, তাদেরকে বর্জন করা প্রত্যেক দায়িত্বশীল মানুষের জন্য একান্ত কর্তব্য। কারণ তারা মানবজাতির শত্রু, মানবতার শত্রু। এদেরকে চেনার উপায় হোচ্ছে এরা কখনোই ঐক্যের পক্ষে কথা বলে না। কোথাও ঐক্য দেখলে এদের গায়ে আগুন ধরে যায়। এদের একমাত্র কাজই হোচ্ছে কিভাবে ঐক্যের বিরুদ্ধে মানুষকে উস্কে দেওয়া যায়, বিভেদকে জাগিয়ে তোলা যায়। সুতরাং পৃথিবীতে আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধানের প্রয়োগ কোরে মানবজাতির মধ্যে সুখ-সমৃদ্ধি এনে অন্যায়-অবিচার যুলুম দূর কোরে আল্লাহর অভিপ্রায় (মানবজাতির শান্তি) বাস্তবায়নে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হোতেই হবে। মনে রাখতে হবে আমরা সুন্দরের পূজারী, আমরা অসুন্দরকে ঘৃণা কোরি। তাই আমাদেরকে আরো মনে রাখতে হবে আমরা যে যে ধর্মের অনুসারীই হই না কেন, আমাদের আগমন মূলত একই দম্পতি আদম-হাওয়া (আঃ) থেকে। সুতরাং সেই সূত্রে আমরা একে অপরের ভাই-বোন। তাই কেন আমরা বিভক্তি টানবো আমাদের নিজেদের মধ্যে? আল্লাহ আমাদেরকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্তি দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শক্তি দান করুন। আমীন। □

মাহবুব আলী

মানবজাতির ঐক্যই আল্লাহর অভিপ্রায়

আল্লাহ সৃষ্টি কোরলেন এই মহাবিশ্ব। কী বিশাল তাঁর এই সৃষ্টি! কী অসীম তার ব্যাপ্তি! সমস্ত সৃষ্টি জগত তিনি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করেন নিজ হাতে। একমাত্র ব্যতিক্রম এই পৃথিবী এবং মানবজাতি। তিনি পৃথিবীর মানুষসহ এখানের সমস্ত উপাদান, জীববৈচিত্র্য সমস্তকিছুর রক্ষণাবেক্ষণ ও শান্তি রক্ষার দায়িত্ব দিলেন তাঁর নিজ হাতে সৃষ্ট খলিফা আদমের উপর। উদ্দেশ্য, পরীক্ষা কোরে দেখা তার সৃষ্ট খলিফা তার দেয়া আমানত, তাঁর ফুঁকে দেয়া রূহ, তার কাদেরিয়াহ অর্থাৎ ইচ্ছা শক্তি নিয়ে কী করে (সূরা আহযাব ৭২, সুরা হেজর ২৯)। আর পরীক্ষার জন্য যেহেতু বিরুদ্ধ শক্তি দরকার, সেহেতু তিনি প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করালেন এবলিসকে।

এই বিরাট কাজ ফুঁ দিয়ে হবে না, এটি বজ্রশক্তিসম্পন্ন একটি জাতির কাজ

আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির আগেই এবলিস এই নতুন সৃষ্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, 'এই নতুন সৃষ্টি তাঁর হুকুম মানবে না' (সুরা আরাফ ১৭)। তারা পৃথিবীতে গিয়ে অন্যায়, অবিচার, জুলুম, নির্যাতন, হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি-কাটাকাটি, যুদ্ধ, রক্তপাত এক কথায় ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা অর্থাৎ অশান্তি কোরবে। আল্লাহ বোললেন তারা যাতে তা না করে তার জন্য তিনি যুগে যুগে পৃথিবীতে হাদী অর্থাৎ নবী রসুলদের মাধ্যমে হেদায়াহ ও সহজ সরল দীন পাঠাবেন। তারা তা মেনে চোললে এবলিসের দাবি করা সেই অশান্তিতে পড়বে না, শান্তিতে বসবাস কোরতে থাকবে। এবলিসও আল্লাহর কাছ থেকে কিছু ক্ষমতা নিয়ে পাল্টা চ্যালেঞ্জ কোরে বোলল যে, সে মানুষকে প্ররোচিত কোরে আল্লাহর হুকুম অমান্য করাবেই অর্থাৎ তার দাবি মোতাবেক মানুষ অশান্তি কোরবেই।

সংক্ষেপে এরপরের ঘটনা এইরূপ: আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি কোরলেন এবং তাকে জান্নাতে বসবাস করার অনুমতি দিলেন। সেখানে প্রথমবারের মতো আদমকে দিয়ে এবলিস আল্লাহর হুকুম অমান্য করাতে সক্ষম হয়। আল্লাহ শাস্তি স্বরূপ তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে পৃথিবীতে নির্বাসনে পাঠান। সেখানে আদম (আ:) বংশবিস্তার কোরতে লাগলেন এবং আল্লাহর পাঠানো হুকুম অনুযায়ী জীবন ধারণ কোরতে থাকেন। ক্রমে আদম সন্তানগণ বৃদ্ধি পেয়ে দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা মোতাবেক প্রত্যেক জনপদে নবী রসুল পাঠিয়ে তাদের জন্য জীবন বিধান দেওয়া অব্যাহত রাখলেন। এদিকে এবলিসও বোসে ছিল না। সে মানুষকে দিয়ে আল্লাহর হুকুম অমান্য করাতে থাকলো। মানবজাতি ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ভৌগোলিক পরিবেশ, তাপমাত্রা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে তাদের গায়ের রং, ভাষা ইত্যাদির পার্থক্য এসে গেলো। তারা পরস্পর বিভিন্ন গোত্রে জাতিতে রাষ্ট্রে বিভক্ত হোয়ে গেলো। এতদিন পর্যন্ত আল্লাহ বিচ্ছিন্ন সকল জনগোষ্টির জন্য নবী রসুল পাঠানো অব্যাহত রাখলেন। নবী রসুলদের আনীত দীন দিয়ে তাঁরা বিদায় নিলে কিছু দিন পরেই তাদের অনুসারীরা শয়তানের প্ররোচনায় ঐ দীন আবার বিকৃত কোরে ফেলেছে, তখন আল্লাহ আবার আরেকজন নবী রসুল অবতার প্রেরণ কোরেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় মানুষ যখন জ্ঞানে বিজ্ঞানে, যোগাযোগে পরস্পর কাছাকাছি চোলে এলো, তখন আল্লাহ পুরো মানবজাতিকে আবার এক বিধানের অন্তর্ভুক্ত কোরে তাদেরকে এক জাতিতে পরিণত কোরতে চাইলেন। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল মানবজাতিকে নিয়ে আল্লাহর চূড়ান্ত অভিপ্রায়।

পূর্ববর্তী দীনসমূহ লক্ষ্য কোরলে দেখা যাবে যে আল্লাহ তাঁর কেতাবগুলিতে শাস্তির দিক দিয়ে মদ্যপান, ব্যভিচার, জেনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রেখেছেন, কিন্তু শেষ কেতাবে দেখা যাবে ঐক্য নষ্ট করার শাস্তি সর্বোচ্চ। এই অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। ঐক্য নষ্ট করা মোনাফেকী এবং কুফর এবং তা কোরলে সরাসরি দীন থেকে বহিষ্কার (আব্দালাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে মোসলেম, মেশকাত)। আল্লাহ ও তাঁর রসুল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কোরেছেন। আল্লাহর রসুল বোলেছেন, 'যে ব্যক্তি এই উম্মতের ঐক্য ও সংহতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি কোরতে চায় তাদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করে, তলোয়ার দ্বারা তোমরা তাকে শায়েস্তা করো, সে যেই হোক না কেন (হাদিস, আরফাজা (রা:) থেকে মোসলেম)।

পক্ষান্তরে সহিহ হাদিসে বেশ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আছে যেখানে কোন লোক নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে ব্যভিচার কোরে ফেলেছেন। পরে শুধু অনুতপ্ত হোয়েই তারা ক্ষান্ত হন নি, তারা আল্লাহর দেয়া শাস্তি গ্রহণ কোরে পবিত্র হোতে চেয়েছে, তারা আল্লাহর রসুলের (দ:) কাছে এসে তাদের ব্যভিচারের কথা প্রকাশ কোরে দিয়ে শাস্তি চেয়েছেন। ঐসব ঘটনায় বিশ্বনবী (দ:) কী কোরেছেন তা লক্ষ্য করার বিষয়। কোন সামান্যতম রাগ করেন নি বরং সমস্ত ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা কোরেছেন। ভাবটা এই রকম যে তুমি অপরাধ কোরে ফেলেছো তো ফেলেছোই সেটা আবার প্রকাশ কোরতে এসেছো কেন? তুমি না বোললে তো কেউ জানবেই না যে তুমি কী কোরেছো। কাজেই ও গোপন ঘটনা গোপনই রাখো। শাস্তি পেতে কৃতসংকল্প সেই লোককে যখন তিনি কিছুতেই বিরত কোরতে পারেন নি তখন তিনি তাকে উকিলের মত জেরা কোরেছেন, এই উদ্দেশ্যে যে যদি ঐ লোকের বর্ণনায় কোন খুঁত বের কোরতে পারেন তবে হয় শাস্তি দেবেন না বা লঘু শাস্তি দেবেন (হাদিস আবু হোরায়রা (রা:) থেকে বোখারী, মুসলীম, মেশকাত)।

কিন্তু ঐক্য নষ্ট করার মত কোন কাজ ঘোটলে তিনি রেগে অগ্নিশর্মা হোয়ে যেতেন। আল্লাহ যাকে এবলিসের উপরে

গালেব কোরেছেন, সেই জিতেন্দ্রীয় মহামানব যখন রেগে লাল হোয়ে যান তখন বুঝতে হবে সেই ব্যাপারটি অনেক সাংঘাতিক। সাংঘাতিক এই জন্য যে এখানে আল্লাহ ও রসুলের জয় পরাজয়ের প্রশ্ন। ব্যক্তির অপরাধ ব্যক্তিকে কলুষিত করে, সেটা তার জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু ঐক্য নষ্ট হোলে ক্ষতি হয় পুরো জাতির। জাতির মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি মানেই আল্লাহর অভিপ্রায়ের পথে অন্তরায়, রসুলের সারা জীবনের উদ্দেশ্যের অন্তরায়, তাঁর আগমনের সফলতা ব্যর্থতার প্রশ্ন। এ কারণেই ঐক্যভঙ্গ হয় এমন যে কোন কাজের বিরুদ্ধে আল্লাহর রসুল এত কঠোর।

আল্লাহর সবচাইতে প্রিয়, সবচাইতে সম্মানিত রসুলকে যদি ফুঁ এর পরিবর্তে প্রাকৃতিকভাবে দায়িত্ব পালন কোরতে হয়, তবে আর কে আছেন যিনি এত পবিত্র, এত পূণ্যবান, এত সম্মানিত, এত মর্যাদাবান যিনি ফুঁ দিয়ে জীবন সম্পদ কোরবানি না কোরে, রক্ত-ঘাম না ঝরিয়ে দাজ্জালকে ধ্বংস কোরে পৃথিবীর কর্তৃত্ব নিয়ে নিবেন? সুতরাং প্রথম সম্ভাবনাটি আমরা বাদ দিতে পারি।

আল্লাহ তাঁর অভিপ্রায়কে পূর্ণতা দেয়ার লক্ষ্যে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে সমস্ত মানবজাতির জন্য নাযেলকৃত পূর্বের সকল বিধানকে রদ কোরে তাঁর সর্বশেষ রসুলের মাধ্যমে একটি বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা পাঠালেন। অন্য সকল নবী রসুলদের থেকে এই শেষ রসুলের পার্থক্য হোল- এবারে তিনি আর কোন নির্দিষ্ট জনপদের জন্য প্রেরিত নন, তাঁর কর্মক্ষেত্র সারা দুনিয়া। দ্বিতীয়ত, এবারে তাঁর আনীত দীন পৃথিবীর বাকি আয়ুষ্কাল অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। আল্লাহর প্রেরিত পূর্বের কেতাবগুলির সংরক্ষণভার এর আগে আল্লাহ নিজ হাতে গ্রহণ করেন নি। আর এবারের শেষ সংস্করণ আল্লাহর কেতাবের রক্ষাভার নিলেন স্বয়ং তিনি নিজে।

যেহেতু শেষ রসুলের দায়িত্ব সারা দুনিয়ায় দীন কায়েম করা, এবং এই কাজ একার দ্বারা সম্ভব নয়, সেহেতু তাঁকে এমন একটি জাতি তৈরি কোরতে হোয়েছে যার নাম উম্মতে মোহাম্মদী, যারা তাঁর অবর্তমানেও তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন কোরে যাবে। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে শান্তি অর্থাৎ এসলাম কায়েম না হবে ততদিন তাঁর উপর আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ হবে না। আল্লাহ তাঁকে যে উপাধি দিয়েছেন, রহমাতাল্লেল আলামিন-সমস্ত দুনিয়ার উপর রহমতস্বরূপ তাও পূর্ণ হবে না। তাঁর চোলে যাওয়ার পর তাঁর সৃষ্ট উম্মতে মোহাম্মদী কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন কোরে গেলেন ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত এবং পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকের উপর এই দীনের বাস্তবায়ন কোরে গেলেন। যেহেতু বাকি দুনিয়ায় এখনো দীন কায়েম হয় নি এবং যতটুকুতে বাস্তবায়িত হোয়েছিল তাও আজ ইহুদি-খ্রিস্টান 'সভ্যতা' অর্থাৎ দাজ্জাল দখল কোরে সারা দুনিয়ায় তার হুকুম কায়েম কোরে রেখেছে, তাই আল্লাহর অভিপ্রায় বাস্তবায়ন কোরতে গেলে আজ সারা দুনিয়াকে দাজ্জালের কবল থেকে উদ্ধার কোরতে হবে। যেহেতু আল্লাহর অভিপ্রায় হোয়েছে এবং আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোরছেন সেহেতু তা হবেই হবে। প্রশ্ন হোল কিভাবে? আল্লাহর রসুলের চোলে যাবার পর তাঁর হাতে গড়া জাতি ৬০/৭০ বছর সংগ্রাম চালিয়ে যাবার পর তা ছেড়ে দেয়। তাঁর গড়া উম্মতে মোহাম্মদী পৃথিবীতে আর বর্তমানে নেই। তাহোলে এই কাজ এখন কোরবে কে?

এই কাজ সোজা নয়। পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত, হাজার হাজার ভাষা, সাদাকালোর ভেদাভেদ, শত শত ভৌগোলিক রাষ্ট্র, হাজারো ধর্মীয় মাজহাব, ফেরকা, তরিকা আর রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা মানবজাতি বিভক্ত হোয়ে আছে। এখন তাদেরকে একজাতিতে পরিণত করা, একজন মাত্র নেতা, এমামের হুকুমে পরিচালিত করা আপাতঃদৃষ্টিতে অসম্ভব। যেখানে পৃথিবীর দক্ষিণপ্রান্ত, যাকে মাত্র আজ থেকে পাঁচশত বছর আগেও মানুষ জানতো না সেখানে কী আছে, সেখানেও আজ মানুষের বসবাস। সাইবেরিয়া- যেখানে মানুষের বসবাস করা ছিল অকল্পনীয়, আজ সেখানে মানুষের অবাধ যাতায়াত। অ্যামাজন জঙ্গলের গহীন অরণ্য, যা মানুষের নিকট ছিল চির রহস্যময়, সেখানে আজ শুধু চেনা জানা নয়, রীতিমত মানুষের নখদর্পণে। হিমালয় পর্বত, যাকে সমীহ কোরে দেব-দেবীদের আস্তানা ভেবে মানুষ তার পাদদেশে পূজা কোরত, সেখানে আজ উন্নত পর্যটন কেন্দ্র। বহু দেশের অভিযাত্রীরা নিজ নিজ দেশের পতাকা উড়িয়ে এসেছেন সেই পর্বত চূড়ায়। ভয়ঙ্কর সাহারা মরুভূমি ছিল মৃত্যুর অপর নাম, সেই সাহারার বুকে আজ মানুষের চাষাবাদ, ঘর বসতি। সুতরাং মানুষ আজ পৃথিবীর সর্বত্র গমন কোরছে, সর্বত্র বসবাস কোরছে। এই সমস্ত মানুষকে তাদের চিন্তা চেতনার ভিন্নতা, আচার আচরণ, ভাষার ভিন্নতা, মন-মানসিকতার তফাৎ, গোত্র, বর্ণের ব্যবধান, সমস্তকিছু ঘুচিয়ে একটি মাত্র জাতিতে পরিণত করা, একজন এমামের, নেতার হুকুমের অধীনে নিয়ে আসা সম্ভব মাত্র দু'টি উপায়ে। প্রথমত, হয় এমন একজন মানুষ আসবেন যিনি একটি মাত্র ফুঁ দিয়ে অলৌকিকভাবে এই কাজ কোরে ফেলবেন, বা তাঁর দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত অলৌকিকভাবে ঐ কাজ সম্পন্ন হোয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত ঐ কাজটি মানুষের মাধ্যমেই কোরতে হবে। অর্থাৎ এমন একদল মানুষ থাকবেন যারা তাদের নেতা যা চান তা যতই কঠিন হোক হুকুমের সাথে সাথে তারা বাস্তবায়ন কোরে ফেলবেন। তাদের সামনে অসম্ভব বোলে কিছু থাকবে না। হিমালয়ের মতো বাধা তাদের সামনে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হোয়ে যাবে। এছাড়া তৃতীয় কোন উপায় নেই।

এবার দেখা যাক সম্ভাব্যতার বিচারে প্রথম উপায়টির উপযুক্ততা কতটুকু। ফুঁ দিয়ে বিরাট একটি কাজ বাস্তবায়ন কোরে ফেলাই যদি কাজটি সম্পাদনের উপায় হোত তবে এর প্রথম হকদার হোতেন আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল নিজে। কারণ, সমস্ত নবী রসুলদের তিনি নেতা, যিনি সমস্ত মানব জাতিকে শাফায়াত করার একমাত্র অধিকারী, যার সম্মান নির্দিষ্ট কোরে দিয়েছেন আল্লাহ মাকামে মাহমুদায়, এবং দুনিয়াময় দীনুল হক প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব শুধুমাত্র তাঁরই উপর। তাঁর পরে যারা এই দায়িত্ব পালন কোরবে তারা শুধু তাঁর অনুসারী উম্মতে মোহাম্মদী হিসাবে দায়িত্ব পালন কোরবে। সুতরাং মহানবীর চাইতে কে বেশি হকদার ফুঁ এর মাধ্যমে ঐ কাজ সম্পাদন করার? তিনি কি তার দায়িত্ব ফুঁ দিয়ে পালন কোরেছিলেন?

ইতিহাস তা বলে না। ইতিহাস বলে অবর্ণনীয় নির্যাতন, জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন, উপহাস, ঠাট্টা, বিদ্রুপ সহ্য কোরে তিনি অটল পর্বতের মতো চালিয়ে গেছেন তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পূরণের সংগ্রাম। প্রাণপ্রিয় সঙ্গী সাথীদের সীমাহীন নির্যাতিত হোতে দেখেছেন তিনি, নিহত হোতে দেখেছেন, তাদের বুকফাটা আর্তি দেখেও কিছু কোরতে না পারার যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হোয়েছে তাঁর আত্মা। সর্বশেষ ওহুদের যুদ্ধে নিজের প্রাণের উপর হুমকি

এলো, আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হোলেন তিনি, দু'টো দাঁত শহীদ হোল, তিনি রক্তাক্ত হোলেন এবং শেষ পর্যন্ত অজ্ঞান হোয়ে গেলেন। ফুঁ দিয়েই যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হোত তবে কেন তিনি এত নির্যাতন মেনে নিলেন? তিনি কি পারতেন না ফুঁ এর মাধ্যমে সব সমস্যা সমাধান কোরে দিতে? তাঁকে জাগতিক পদ্ধতিতেই মোকাবেলা কোরতে হোয়েছে সমস্ত প্রতিকূলতার। আল্লাহর সবচাইতে প্রিয়, সবচাইতে সম্মানিত রসুলকে যদি ফুঁ এর পরিবর্তে প্রাকৃতিকভাবে দায়িত্ব পালন কোরতে হয়, তবে আর কে আছেন এত পবিত্র, এত পুণ্যবান, এত সম্মানিত, এত মর্যাদাবান যিনি ফুঁ দিয়ে জীবন সম্পদ কোরবানি না কোরে, রক্ত-ঘাম না ঝরিয়ে দাজ্জালকে ধ্বংস কোরে পৃথিবীর কর্তৃত্ব নিয়ে নিবেন? সুতরাং প্রথম সম্ভাবনাটি আমরা বাদ দিতে পারি।

মানবজাতির ইতিহাসে বোধ হয় এ এক মহা অলৌকিক ঘটনা হবে, মো'জেজা হবে যে একজন মানুষ যিনি এক প্রচণ্ড বজ্রশক্তিধর জাতির এমাম, তিনি সমস্ত পৃথিবীতে যা চাইবেন তা হোয়ে যাবে, অর্থাৎ কার্যকরী হবে। এই যে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কাজ হোয়ে যাওয়া অর্থ যে এক মুহূর্তের মধ্যে হবে তা নয়, তবে সেই কাজ হবে। সেই কাজ তাঁর বজ্রশক্তিধর জাতি সম্পাদন কোরে ফেলবে।

দ্বিতীয় পথ রোইল প্রাকৃতিকভাবে সত্যিকার মোকাবেলায় দাজ্জালের কর্তৃত্বকে ধ্বংস কোরে আল্লাহর রসুলের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। আগেই বোলেছি এ কাজ অত সোজা নয়। কিন্তু যতই কঠিন হোক কাউকে না কাউকে দিয়ে আল্লাহ তাঁর অভিপ্রায় পূর্ণ কোরবেনই, মানবজাতিকে একটি দীনের আওতায় আনবেনই। তাই যিনি একাজ সম্পন্ন কোরবেন অবশ্যই তার ঠিক ঐ রকম বজ্রশক্তি সম্পন্ন একদল অনুসারী থাকতে হবে যেমন ছিলেন আসহাবে রসুলগণ। তাদেরকে এমন হোতে হবে যে তাদের নেতা, এমাম যা বোলবেন তা যতই কঠিন হোক তারা সঙ্গে সঙ্গে তা বাস্তবায়ন কোরে ফেলবেন। তাদের সামনে অসম্ভব বোলে কিছু থাকবে না। এমন একটি বজ্রশক্তিসম্পন্ন জাতি ছাড়া পৃথিবীর বুকে ঐ কাজ কিছুতেই সম্ভব নয়। ঐ জাতির কাজ হবে একটাই, আর তা হোচ্ছে শুধুমাত্র আদেশ শোনা আর পালন করা। তারা কোন প্রশ্ন কোরবে না, দ্বিধা কোরবে না, কালক্ষেপণ কোরবে না। তাদের গুণ হবে ঐ একটাই। তারা পণ্ডিত হোক অথবা বোকা হোক, মহাশিক্ষিত হোক অথবা একেবারে নিরক্ষর হোক, ঐ একটা গুণ ছাড়া এ দুনিয়া বিজয় সম্ভব নয়। মানবজাতির ইতিহাসে বোধ হয় এ এক মহা অলৌকিক ঘটনা হবে, মো'জেজা হবে যে একজন মানুষ যিনি এক প্রচণ্ড বজ্রশক্তিধর জাতির এমাম, তিনি সমস্ত পৃথিবীতে যা চাইবেন তা হোয়ে যাবে, অর্থাৎ কার্যকরী হবে। এই যে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কাজ হোয়ে যাওয়া অর্থ যে এক মুহূর্তের মধ্যে হবে তা নয়, তবে সেই কাজ হবে। সেই কাজ তাঁর বজ্রশক্তিধর জাতি সম্পাদন কোরে ফেলবে। এদের মাধ্যমেই পূর্ণ হবে আল্লাহর অভিপ্রায়, সমগ্র মানবজাতি শুরুতে যেমন ছিল একটি পরিবারভুক্ত আবার তারা একই পরিবারভুক্ত হোয়ে যাবে। সে সময় এনশা'আল্লাহ অতি সন্নিকটে। □

প্রচলিত 'এসলাম' এসলাম নয় কেন?

ঐক্যহীনতা 'কুফর'

মসীহ উর রহমান

বর্তমানে সারা দুনিয়াতে এসলামের যে বিভিন্ন রকম রূপ আমরা দেখছি তার কোনটিই আল্লাহর প্রেরিত এসলাম নয়। এর সবগুলিই বিকৃত। কিভাবে এই বিপুল বিকৃতি সাধিত হোল সেই ব্যাপক আলোচনা আমার আলোচ্য নয়, এটা যে আল্লাহ ও রসুলের প্রকৃত এসলাম নয় তা সন্দেহাতীতভাবে এবং অকাট্যভাবে (Irrefutably) তুলে ধরাই আমার আলোচনার পরিসীমা। এটা সহজ সূত্র যে, এসলামের অনুসারীই হোচ্ছে মোসলেম, সুতরাং আমি যদি এটা প্রমাণ কোরতে সক্ষম হই যে, বর্তমানে প্রচলিত এসলাম আল্লাহর নাযেলকৃত 'এসলাম' নয়, তাহোলে এটাও স্বতঃপ্রমাণিত হবে যে, বর্তমান প্রচলিত 'এসলাম'-এর যারা অনুসারী তারাও প্রকৃত মোসলেম নয়, প্রকৃত মো'মেনও নয়। আসুন, একটি চূড়ান্ত সত্যের উদ্ঘাটনে যাত্রা শুরু কোরি।

জাতির ঐক্য এতটাই প্রয়োজনীয় (Vital) বিষয় যে একটি জাতি একটি সংগঠন যত শক্তিশালীই হোক যত প্রচণ্ড শক্তিশালী অস্ত্র-শস্ত্র, ধন-সম্পদের অধিকারীই হোক, যদি তাদের মধ্যে ঐক্য না থাকে তবে তারা কখনই জয়ী হোতে পারবে না। অতি দুর্বল শত্রুর কাছেও তারা পরাজিত হবে। তাই আল্লাহ কোর'আনে বহুবার এই ঐক্য অটুট রাখার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। এই ঐক্য যাতে না ভাঙ্গে সে জন্য তার রসুল (দঃ) সদা শংকিত ও জাগ্রত থেকেছেন এবং এমন কোনো কাজ যখন কাউকে কোরতে দেখেছেন, যাতে ঐক্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে তখন রেগে গেছেন। একদিন দুপুরে আব্দাল্লাহ বিন আমর (রাঃ) রসুলাল্লাহর গৃহে যেয়ে দেখেন তার মুখ মোবারক ক্রোধে লাল হোয়ে আছে। কারণ তিনি দু'জন আসহাবকে কোর'আনের একটি আয়াত নিয়ে মতবিরোধ কোরতে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি (দঃ) বোললেন- কোর'আনের আয়াতের অর্থ নিয়ে যে কোনো রকম মতভেদ কুফর। নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ তাদের কিতাবগুলির (আয়াতের) অর্থ নিয়ে

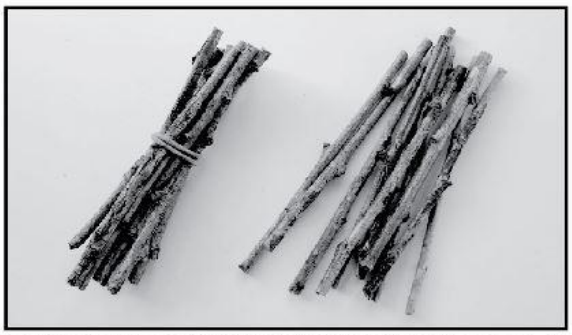

রসুলাল্লাহ বলেছেন, যে কোন প্রকার অনৈক্যই কুফর (হাদীস)। তাছাড়া এটা সাধারণ জ্ঞান যে ঐক্যবদ্ধ দশ জনের নিকট ঐক্যহীন একশ' জনও পরাজিত হবে যার প্রমাণ বর্তমান মোসলেম নামক জনসংখ্যা।

মতবিরোধের জন্য ধ্বংস হোয়ে গেছে। তারপর তিনি আরও বোললেন (কোর'আনের) যে অংশ (পরিস্কার) বোঝা যায় এবং ঐকমত্য আছে তা বল, যে গুলো বোঝা মুশকিল সেগুলোর অর্থ আল্লাহর কাছে ছেড়ে দাও (মতবিরোধ কোরোনা) (হাদিস-আব্দাল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে- মোসলেম, মেশকাত)। বিশ্বনবী (দঃ) রেগে লাল হোয়েছিলেন কেন? কারণ যদিও তিনি পরিস্কার বোলেই দিলেন অর্থাৎ আয়াতের অর্থ নিয়ে মতবিরোধ হোয়ে জাতির ঐক্য নষ্ট ও পরিণামে যে জন্য জাতির সৃষ্টি সেই সংগ্রামে শত্রুর কাছে পরাজয় ও পৃথিবীতে এই দীনকে প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা। তবুও ইতিহাস এই যে, যে কাজকে রসুলাল্লাহ (দঃ) কুফর বোলে আখ্যায়িত কোরেছেন সেই কাজকে মহা সওয়াবের কাজ মনে কোরে করা হোয়েছে এবং হোচ্ছে অতি উৎসাহের সাথে এবং ফলে বিভিন্ন মাযহাব ও ফেরকা সৃষ্টি হোয়ে জাতির ঐক্য নষ্ট হোয়ে গেছে এবং জাতির শত্রুর কাছে শুধু পরাজিতই হয় নি তাদের ক্রীতদাসে পরিণত হোয়েছে।

বিদায় হজ্বে বিশ্বনবীর (দঃ) ভাষণ মনযোগ দিয়ে পড়লে যে বিষয়টা সবচেয়ে লক্ষণীয় হোয়ে ওঠে সেটা তাঁর জাতির ঐক্য সম্বন্ধে তাঁর ভয় ও চিন্তা। স্বভাবতঃই কারণ জীবনের সবকিছু কোরবান কোরে অসহনীয় অত্যাচার সহ্য কোরে সারা জীবনের সাধনায় একটি জাতি সৃষ্টি কোরলে এবং সেই জাতির উপর তাঁর আরদ্ধ কাজের ভার ছেড়ে পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার সময় একটা মানুষের মনে ঐ ভয়, ঐ শংকাই সবচেয়ে বড় হোয়ে দাঁড়াবে। কারণ ঐক্য ভেঙ্গে গেলেই সবশেষ, জাতি আর তাঁর আরদ্ধ কাজ করতে পারবে না, শত্রুর কাছে পরাজিত হবে। তাই তাঁকে বিদায় হজ্বের ভাষণে বোলতে শুনি- হে মানুষ সকল! আজকের এই দিন (১০ই জিলহজ্ব), এই মাস (জিলহজ্ব) এই স্থান (মক্কা ও আরাফাত) যেমন পবিত্র, তোমাদের একের জন্য অন্যের প্রাণ, সম্পদ ও ইজ্জত তেমনি পবিত্র (হারাম)। শুধু তাই নয় এই দিন, এই মাস ও এই স্থানের পবিত্রতা একত্র কোরলে যতখানি পবিত্র হয়, তোমাদের একের জন্য অন্যের জান-মাল-ইজ্জত ততখানি পবিত্র (হারাম)। খবরদার! খবরদার! আমার (ওফাতের) পর তোমরা একে অন্যকে হত্যা কোরে কুফরী কোরো না। শেষ নবী (দঃ) এই সাবধান বাণী একবার নয়- পুনঃপুনঃ উচ্চারণ কোরলেন এবং শেষে আসমানের দিকে মুখ তুলে বোললেন - হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক- আমি আমার দায়িত্ব পৌছে দিলাম। হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক- আমি আমার দায়িত্ব পৌছে দিলাম। এখানে লক্ষ্য কোরুন নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটিকে, অর্থাৎ জাতির ঐক্যকে নষ্ট বা ক্ষতি করাকে শেষ নবী (দঃ) কোন্ শ্রেণির গোনাহের পর্যায়ে ফেলছেন। একেবারে কুফরের পর্যায়ে। তাই আল্লাহর রসুল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, 'যে ব্যক্তি এই উম্মতের ঐক্য ও সংহতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি কোরতে চায় তাদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করে, তলোয়ার দ্বারা তোমরা তাকে শায়েস্তা করো, সে যেই হোক না কেন (হাদিস, আরফাজা (রাঃ) থেকে মোসলেম)।

আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরতে নিষেধ কোরেছেন এবং আল্লাহর রসুলও বিদায় হজ্বের ভাষণে দীন, জীবনব্যবস্থা নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরতে নিষেধ কোরেছেন। বাড়াবাড়ি অর্থ হোচ্ছে অতি বিশ্লেষণ এবং যতটুকু বলা হোয়েছে তার চেয়ে বেশি বেশি করা, আধিক্য (তাশাদ্দুদ) করা। এমন কোনো কাজ দেখলে রসুলাল্লাহ রেগে লাল হোয়ে যেতেন এবং যারা তা কোরত তাদেরকে কঠিনভাবে তিরস্কার কোরতেন। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোনো বিষয়ে মসলাহ জানতে চাইলে বিশ্বনবী (দঃ) প্রথমে তা বোলে দিতেন। কিন্তু কেউ যদি আরও একটু খুঁটিয়ে জানতে চাইতো তাহোলেই তিনি রেগে যেতেন। একদিন একজন পথে পড়ে থাকা জিনিসপত্র কি করা হবে এ ব্যাপারে রসুলাল্লাহর (দঃ) কাছে মসলাহ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তার জবাব দিয়ে দিলেন। ঐ লোকটি যেই জিজ্ঞাসা কোরলেন যে যদি হারানো উট পাওয়া যায় তবে তার কি মসলাহ? অমনি সেই জিতেন্দ্রিয় মহামানব এমন রেগে গেলেন যে তার পবিত্র মুখ লাল টকটকে হোয়ে গেলো (হাদিস-যায়েদ এবনে খালেদ জুহানী (রাঃ) থেকে বোখারী)। কিন্তু তাঁর অত ক্রোধেও অত নিষেধেও কোনো কাজ হয় নি। তাঁর

ইহুদি খ্রিস্টান সভ্যতা 'দাজ্জালের' অবরোধের শিকার আফ্রিকার 'মোসলেমদের' করুণ অবস্থা।

অথচ পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে এখন অনেক মোসলেম দেশেও কুকুরের পেছনে যে খরচ করা হয় তা দিয়ে অভাবগ্রস্ত অনেক পরিবার চোলতে পারবে।

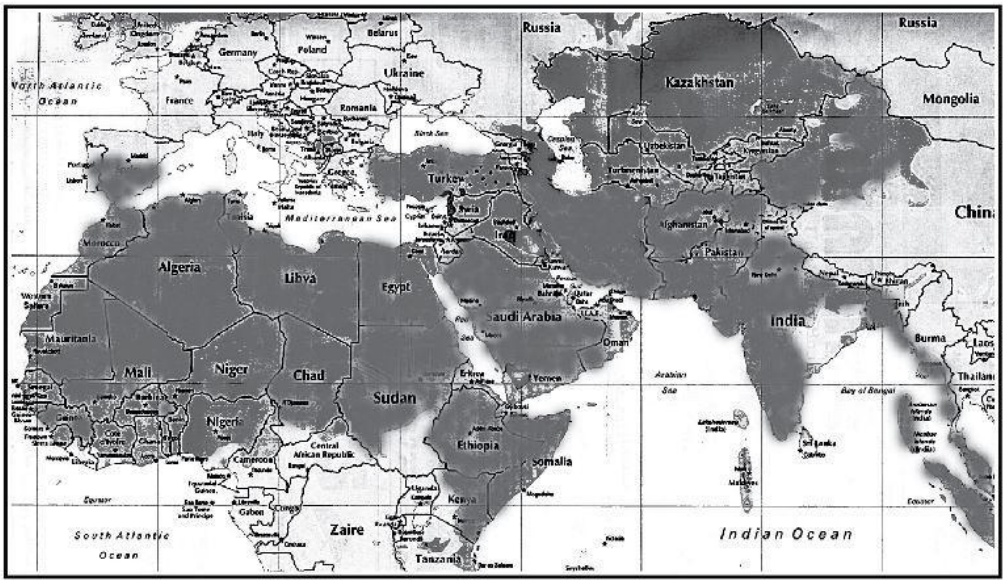

উম্মতে মোহাম্মদীর দায়িত্ব ছিল সারা পৃথিবীকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ছায়াতলে নিয়ে আসা এবং শতধাবিভক্ত মানবজাতিকে একটি জাতিতে পরিণত করা। ১৪০০ বছর আগে এই জাতি তদানীন্তন অর্ধ পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করার পর তাদের উদ্দেশ্যচ্যুতি ঘটে। ফলে আজ আবার তারা শতধাবিচ্ছিন্ন হোয়ে অন্য জাতির গোলামে পরিণত হোয়েছে।

জাতিটিও ঠিক পূর্ববর্তী নবীদের (আ:) জাতিগুলির মতো দীন নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি কোরে অতি মোসলেম হোয়ে মসলা-মাসায়েলের তর্ক তুলে বিভেদ সৃষ্টি কোরে হতবল, শক্তিহীন হোয়ে শত্রুর কাছে পরাজিত হোয়ে তাদের গোলামে পরিণত হোয়েছে।

দীনের যে কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক, মতভেদ করাকে তিনি বার বার কুফর বোলে আখ্যায়িত কোরেছেন, কারণ এতে জাতির ঐক্য বিনষ্ট হয়। জাতির অখণ্ডতা ও অবিভাজ্যতা সম্পর্কে আল্লাহ ও রসুলের এমন স্পষ্ট উদাহরণ ও নীতিমালা সত্ত্বেও বাস্তবে এক মোসলেম জাতি আজ শরিয়াহগতভাবে শিয়া সুন্নি, হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী, আহলে হাদিস ইত্যাদি ভাগে, আধ্যাত্মিকভাবে, কাদেরিয়া, নক্‌শবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া, আহলে বাইত ইত্যাদি হাজারো ভাগে, ভৌগোলিকভাবে ৫৫টিরও বেশি রাষ্ট্রে বিভক্ত এবং ইহুদি খ্রিস্টানের নকল কোরে হাজারো রাজনৈতিক দলে কেউ গণতন্ত্রী, কেউ সমাজতন্ত্রী, কেউ সাম্যবাদী, কেউ রাজতন্ত্রী, কেউ পুঁজিবাদী; গণতন্ত্রীদের মধ্যে কেউ সংসদীয় গণতন্ত্রী, কেউ পুঁজিবাদী গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে কেউ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী, কেউ চীনাপন্থী, মাওবাদী, কেউ মার্কসপন্থী, লেলিনবাদী ইত্যাদি মতাদর্শকে ভিত্তি কোরে হাজার হাজার দলে বিভক্ত। আল্লাহ বলেন, "সকল মো'মেন ভাই ভাই (সুরা হুজরাত ১০)"। রসুলাল্লাহ (দ:) বোলেছেন, 'সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদী জাতি যেন একটা শরীর, তার একটা অঙ্গে ব্যথা পেলে সারা শরীরেই ব্যথা অনুভূত হয়' (আব্দাল্লাহ এবনে ওমর রা: থেকে বোখারী মোসলেম আবু দাউদ)। সেই উম্মতে মোহাম্মাদীর দাবিদার, এক মোসলেম জাতির দাবিদার হাজারো লক্ষ ভাগে বিভক্ত হোল, বিভক্ত হোয়ে নিজেরা নিজেরা মারামারি, যুদ্ধ, রক্তপাত, দাঙ্গা ইত্যাদি কোরল এতে জাতির যে সংজ্ঞা রসুল দিলেন অর্থাৎ 'এক দেহ' তা থাকলো কিনা?

ব্যক্তিগত তাকওয়া এবং সওয়াব কামাতে এই জাতি এতটাই ব্যস্ত যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যে অগণ্য বনী আদম যারা তাদের মতোই মোসলেম দাবিদার, তাদের মতোই এক আল্লাহ, এক রসুল ও এক কোর'আনে বিশ্বাসী, তারা অন্যান্য জাতিগুলির দ্বারা পশুপাখির মতো গুলি খেয়ে মোরছে, মেয়েরা ধর্ষিত হোচ্ছে, অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হোচ্ছে, লাখে লাখে বাস্তুহারা হোচ্ছে তাদের প্রতি অন্যান্য মোসলেমরা কোনরূপ সহানুভূতির হাত বাড়ান না, খবরও রাখেন না। এই হতভাগ্য 'মোসলেম' জাতিরই একটা অংশ রোহিঙ্গা নামক জনগোষ্ঠীকে বৌদ্ধরা সাগরে নিয়ে ডুবিয়ে মারছে হাজারে হাজারে, আগুনে পুড়িয়ে মারছে নারী ও শিশুদের, যাদের অধিকাংশ নারীই জীবনে একাধিকবার ধর্ষিতা হোয়েছেন, যাদের জীবনটাই মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর, সেই রোহিঙ্গাদের খোঁজ নেওয়ার কোনো সময় নেই এই অতি মুসল্লীদের, তাদের এস্তেঞ্জার পর ঢিলা কুলুখ নেওয়ার অধিকার থাকলেই হোল, চেক রুমাল কাঁধে চাপিয়ে দিনে পাঁচবার মসজিদে যেতে পারলেই হোল, এভাবেই তারা যিকিরে ফিকিরে জীবন কাটিয়ে দিতে চান। ফিলিস্তিনের আজন্ম নির্যাতিত মোসলেমদের জন্য তাদের প্রাণ কাঁদে না, আফ্রিকায়, সোমালিয়ায় না খেয়ে খেয়ে জীবন্ত কঙ্কাল হোয়ে ঘুরে বেড়ানো হাজার হাজার মোসলেমের ক্ষুধা অনুভব করার মতো আত্মা তাদের নেই। কারণ তারা আর এক উম্মাহ নেই, একটি দেহের মতো তাই এক অঙ্গে আঘাত পেলে সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা অনুভব করারও প্রশ্ন ওঠে না।

এ তো গেল বহিঃশত্রুর দ্বারা নিষ্পেষিত হওয়ার বৃত্তান্ত, তথাকথিত মোসলেমরা নিজেরাই ভিন্ন মাজহাব ফেরকার অনুসারী মোসলেমদের নির্যাতন ও নিপীড়ন কোরতে কম পটু নন। বিগত কয়েক শতাব্দীতে শুধু মাত্র শিয়া সুন্নি সংঘর্ষ এবং নিজেদের দুঃখজনক ভৌগোলিক রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ সংঘাত যুদ্ধ কোরে যে পরিমাণে নিহত ও আহত হোয়েছে তা বহিঃশত্রুর হামলার চাইতেও কয়েক গুণ; অথচ রসুলাল্লাহ বোলেছেন, ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতে নিহতদের উভয়পক্ষই জাহান্নামী। শিয়া-সুন্নি, সরকারী-কাওমী, ওয়াহাবি-খারেজী-কাদিয়ানী ইত্যাদিরা এসলাম থেকে কে কতটুকু দূরে গেছে সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, সোজা কথা এরা মো'মেন নয়, মোসলেম নয়, উম্মতে মোহাম্মদী নয়। তারা প্রত্যেকেই এসব কোরে জাতির ঐক্য নষ্ট কোরে রসুলের কথা মোতাবেক কুফর কোরেছে, ফলে কার্যতঃ কাফের হোয়ে গেছে। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যারা কাফের তাদের নামাজ, রোজা, হজ্ব কোনো কিছুই কবুল হবে না এবং তারা জাহান্নামী। সুতরাং ঐক্য নষ্ট কোরে এই জাতি আল্লাহ ও রসুলের এসলাম থেকে বর্হিগত হোয়ে গেছে বহু আগেই। এখন আবার সকল ভেদাভেদ ভুলে আল্লাহর তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া আর পথ নাই। আর এ আহ্বানই কোরছে হেযবুত তওহীদ। □

তওহীদের আহ্বান

হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো। আল্লাহ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে যে তোমাদেরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে জীবনোপকরণ দান করে? তিনি ব্যতীত কোন এলাহ নেই। সুতরাং কিভাবে তোমরা সত্যবিমুখ হোচ্ছ? (সূরা ফাতির ৩)।

এই দীনের ভিত্তি হোচ্ছে- স্রষ্টাকে, আল্লাহকে একমাত্র প্রভু, শুধু একমাত্র প্রভু নয়, সর্বময় প্রভু বোলে স্বীকার ও বিশ্বাস করা। এই ব্যাপারে আল্লাহ নিজের সম্বন্ধে যে শব্দটি ব্যবহার কোরেছেন সেটা হলো 'এলাহ'। বর্তমানে এর অনুবাদ করা হয় 'উপাস্য' শব্দ দিয়ে। এই উপাস্য শব্দ দিয়ে এর অনুবাদ হয় না। কারণ হোচ্ছে এই যে- এসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও মানুষ একে বিকৃত কোরে পৃথিবীর অন্যান্য বিকৃত ধর্মের মতো কোরে ফেলেছে। যার একটা বিকৃতি হলো আল্লাহর দেয়া বিধান থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি জাতীয় ব্যাপারগুলো সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে শুধু ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলিতে এবং আনুষ্ঠানিক উপাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ কোরে রাখা; কিন্তু 'এলাহ' শব্দটি আল্লাহ যে অর্থে ব্যবহার কোরেছেন তা হোল- যার বিধান এবং নির্দেশ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি ব্যাপারে অলংঘনীয়। অর্থাৎ 'লা- এলাহা এল্লা আল্লাহ'র ঘোষণা দেওয়া মানেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সর্বস্তরে **যেখানেই আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কোন বক্তব্য আছে সেটা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি যে বিভাগেই হোক না কেন, সেই ব্যাপারে আর কারও কোন বক্তব্য, নির্দেশ মানা যাবে না। মানলে সেটা হবে শেরক, আর** শেরক আল্লাহ কিছুতেই মাফ কোরবেন না (সূরা নেসা ৪৮, ১১০, ১১৬)।

আল্লাহর এই একটি মাত্র দাবি। সেই দাবিও মোসলেম নামক জনসংখ্যাটি প্রত্যাখ্যান কোরেছে। তারা আল্লাহর হুকুম পরিত্যাগ কোরে মানুষের তৈরি দীন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদি দ্বারা তাদের জীবন পরিচালনা কোরছে। আজ তাদের দুই প্রভু, দুই বিধাতা, দুই এলাহ। এরা এক এলাহের অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রচুর নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, দাড়ি, টুপি, কুলুখ, দোয়া, দরুদ, তাহাজ্জুদ লম্বা কোর্তা, অপ্রয়োজনীয় ওয়াজ, চিৎকার কোরে যিকর করে, নারীদের গৃহকোণে অবরুদ্ধ কোরে রাখে। আর অন্য এলাহ অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিস্টান 'সভ্যতা'র এবাদত কোরে তাদের তৈরি বিচার ব্যবস্থায় বিচার করে, তাদের তৈরি দণ্ডবিধি অনুযায়ী শাস্তি ও পুরস্কার দিয়ে, তাদের তৈরি তন্ত্র মন্ত্র অনুযায়ী রাজনৈতিক ও সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করে। এর চেয়ে বড় শেরক সম্ভব নয়।

বিভিন্ন ধর্মে ঐক্যের গুরুত্ব

হুমায়ূন কবির

আল্লাহ যে সব প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন কোরে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি কোরেছেন তার একটি হোল ঐক্য অনৈক্যের চেয়ে শক্তিশালী। দশজন ঐক্যবদ্ধ লোক একশ' ঐক্যহীন লোকের চেয়ে শক্তিশালী। কোন জাতি বা রাষ্ট্র যদি জনসংখ্যায়, অস্ত্রশস্ত্রে, সম্পদে মহাশক্তিধরও হয় কিন্তু যদি সেটার মধ্যে ঐক্য না থাকে তবে সেটা অনেক কম শক্তির শত্রুর কাছে পরাজিত হবে। এ সত্য চিরন্তন এবং যে কোন জাতি, রাষ্ট্র, গোত্র, এমনকি একটি পরিবারের জন্যও সত্য। সমস্ত পৃথিবীতে এই দীনুল এসলামকে প্রতিষ্ঠার মত বিরাট কাজ ঐ ঐক্য ছাড়া মোটেই সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তাঁর কোর'আনে এই ঐক্য এই উম্মাহর মধ্যে অটুট রাখার জন্য বারবার বোলেছেন। সূরা আল এমরানের ১০৩ নং আয়াতে বোলেছেন- ঐক্যবদ্ধ হোয়ে আল্লাহর রজ্জু (হেদায়াহ, দীন) ধোরে রাখতে, বিচ্ছিন্ন না হোতে; সূরা আস্ সফ-এর ৪ নং আয়াতে আমাদের আদেশ কোরছেন গলিত সীসার দেয়ালের মত ঐক্যবদ্ধ হোয়ে জেহাদ কোরতে। গলিত সীসার দেয়ালে একটি সূঁচ ঢোকার জায়গাও থাকে না। যাদের কাজে, কথায় ঐক্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে তাদের জন্য রেখেছেন কঠিন শাস্তি, আযাব কোর'আনের বহু স্থানে। যে সব কাজে ও কথায় উম্মাহর ঐক্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে সে সব কাজকে আল্লাহর রসুল সরাসরি কুফর বোলে আখ্যায়িত কোরেছেন।

কেবল শেষ দীনেই নয়, ইতোপূর্বে আল্লাহ যত নবী রসুল পাঠিয়েছেন এবং তাদের প্রতি যত কেতাব নাযেল কোরেছেন সর্বত্র জাতির ঐক্যের বিষয়ে বিরাট গুরুত্ব আরোপ করা হোয়েছে। সনাতন ধর্মের গ্রন্থগুলিতেও ঐক্যের বিষয়ে বলা আছে। যেমন মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে মহাত্মা বিদুর বোলছিলেন, "দৃঢ়বদ্ধমূল অতিমহৎ একমাত্র মহীরুহ সমীরণভরে অনায়াসে মর্দিত ও পতিত হইয়া থাকে, কিন্তু বহু বৃক্ষ একত্র মিলিত ও বদ্ধমূল হইলে অক্লেশে প্রবল বায়ুবেগ সহ্য করিতে পারে; এইরূপ গুণসমন্বিত ব্যক্তিও একাকী হইলে শত্রুগণ তাঁহাকে পরাজয় করা অনায়াসসাধ্য মনে করিয়া থাকে।" সরল বাংলায় বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে যদি বিরাট কোন বৃক্ষ একাকী দাঁড়িয়ে থাকে, তাহোলে প্রবল ঝড়ে সেটা উপড়ে পড়ে যায়। পক্ষান্তরে বহুসংখ্যক বৃক্ষ একত্রিতভাবে থাকলে প্রবল ঝড়েও তাদের তেমন কোন ক্ষতি হয় না। একইভাবে অতি বড় বীরও একা থাকলে শত্রুরা তাকে পরাজিত করাকে সহজ মনে করে। ঐক্যের শক্তি কত বিরাট তা এই প্রাকৃতিক ঘটনাটির মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

আজ আমাদের দেশের এই ষোল কোটি মানুষ শত সহস্রভাবে বিভক্ত হোয়ে আছে। তারা বিচ্ছিন্ন গাছের মতো একাকী ও শক্তিহীন। তাই যে কোন হালকা ঝড়েও তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হোয়ে যায়। বর্তমানে আমাদের দেশ বহুমুখী সঙ্কটে পতিত হোয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতায় দেশের রাস্তাঘাট বিনষ্ট হোয়ে গেছে, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হোয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা। শত শত গাড়ি পোড়ানো হোয়েছে, সহিংসতায় প্রাণ হারিয়েছে শত শত মানুষ। এই অবস্থা থেকে বাঁচতে চায় প্রতিটি মানুষ। তাদের বাঁচার উপায় এখন একটাই, তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হোতে হবে। আমরা যামানার এমামের অনুসারীরা এই ষোল কোটি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান কোরছি। আসুন, আমরা নিজেদের জীবন-সম্পদ রক্ষার্থে, আমাদের সন্তানদের সুখময় জীবনের প্রত্যাশায় নিজেদের মধ্যেকার সকল ভেদাভেদ ভুলে এক জাতি হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হোই। আমাদের ঐক্যের পথে কোন ক্ষুদ্রস্বার্থ, ক্ষুদ্রচিন্তাই যেন বাধা হোয়ে দাঁড়াতে না পারে। কিন্তু যারা এই শ্বাসরুদ্ধকর অচলাবস্থা টিকিয়ে রাখতে চায় তারা মানুষ নয়, তারা মানুষরূপী শয়তান। তারা চায় সাধারণ মানুষকে মেরে নিজেদের স্বার্থ হাসিল কোরতে। এদেরকে আমাদের চিনতে হবে এবং তাদেরকে বর্জন কোরতে হবে। ষোল কোটি মানুষের বত্রিশ কোটি হাত একতাবদ্ধ হোলে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে আমরা হবো সবচেয়ে সম্মানিত জাতি। □

যামানার এমামের ব্যক্তিজীবন

ঐতিহ্যবাহী পন্নী জমিদার পরিবারের সন্তান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তাঁর পরিবারের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন। সুলতানী যুগে এবং মোগল আমলে এ পরিবারের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন অত্র এলাকার শাসক। এমন কি তারা দীর্ঘকাল বৃহত্তর বাংলার (তদানীন্তন গৌড়) স্বাধীন সুলতান ছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতির সঙ্গে এই পরিবারের কীর্তি এক সূত্রে গাঁথা। প্রাচ্যের আলীগড় 'সা'দাত কলেজের' প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ওয়াজেদ আলী খান পন্নী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন এমামুয্যামানের মায়ের দিকের পূর্বপুরুষ। এমামুয্যামানের নিজেরও রোয়েছে এক কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবন-ইতিহাস। তিনি ছিলেন সত্যের মূর্ত প্রতীক যিনি তাঁর সমগ্র জীবন সত্য সন্ধান এবং সত্যের জন্য লড়াই কোরে গেছেন। তাঁর ৮৬ বছরের জীবনে একবারের জন্যও আইনভঙ্গের কোন রেকর্ড নেই, নৈতিক স্খলনের কোন নজির নেই। আধ্যাত্মিক ও মানবিক চরিত্রে বলীয়ান এ মহামানব সারাজীবনে একটিও মিথ্যা শব্দ উচ্চারণ করেন নাই।

মাননীয় এমামুয্যামান, The Leader of the Time
জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

মাননীয় এমামুয্যামান ১৫ শাবান ১৩৪৩ হেজরী মোতাবেক ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ শেষ রাতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব কাটে করটিয়ার নিজ গ্রামে। ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজে তাঁর শিক্ষালাভের সময় পুরো ভারত উপমহাদেশ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল আর কোলকাতা ছিল এই বিপ্লবের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। আন্দোলনের এই চরম মুহূর্তে তরুণ এমামুয্যামান আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকীর প্রতিষ্ঠিত 'তেহরীক এ খাকসার' নামক আন্দোলনে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। সেই সুবাদে তিনি এই সংগ্রামের কিংবদন্তীতুল্য নেতৃবৃন্দের সাহচর্য লাভ করেন যাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্, অরবিন্দু বোস, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী অন্যতম। ছোট বেলা থেকেই তাঁর ছিল শিকারের শখ। শিকারের লোমহর্ষক সব অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর লেখা 'বাঘ-বন-বন্দুক' (১৯৬৪) নামক বইটি খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়। ক্রীড়াঙ্গনেও তিনি ছিলেন একজন অগ্রপথিক। ১৯৫৪ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

১৯৬৩ সনে এমামুয্যামান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য অর্থাৎ এম.পি. নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান আবু সাঈদ চৌধুরী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, জাতীয় কবি কাজী নজরুল এসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ নজরুল একাডেমির একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ১৯৬৩ সনে তিনি করটিয়ায় হায়দার আলী রেডক্রস ম্যাটার্নিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করেন যার দ্বারা এখনও উক্ত এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হোচ্ছেন। পরবর্তীতে তিনি সা'দাত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন নামে প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নয়নের জন্য একটি দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

ছোটবেলায় যখন তিনি মোসলেম জাতির পূর্ব ইতিহাসগুলি পাঠ করেন তখনই তাঁর মনে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। তিনি মোসলেম জাতির অতীতের সাথে বর্তমান অবস্থার এই বিরাট পার্থক্য দেখে ভাবতে থাকেন যে কিসের পরশে এই জাতি ১৪০০ বছর পূর্বে শিক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে, ধনবলে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি অঙ্গনে অগ্রণী জাতিতে পরিণত হোয়েছিল, আর কিসের অভাবে আজকে তারা দুনিয়ার সবচেয়ে হতদরিদ্র ও অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত, সব জাতির দ্বারা লাঞ্ছিত এবং অপমানিত? মহান আল্লাহ ধীরে ধীরে তাঁকে এই প্রশ্নের জবাব দান কোরলেন। ষাটের দশকে এসে তাঁর কাছে বিষয়টি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হোয়ে ধরা দিল। মানবজাতির সামনে এই মহাসত্য তুলে ধরার জন্য বই লিখেন এবং ১৯৯৫ সনে হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৬ জানুয়ারী ২০১২ ঈসায়ী এই মহামানব প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে পর্দাগ্রহণ করেন। □

সাধারণ মানুষের ঐক্যহীনতার সুযোগ নিচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো

প্রাচীনকাল থেকেই আবহমান বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবেই বসবাস কোরে এসেছে। তখন বিভিন্ন রাজা বাদশাহগণ দেশ পরিচালনা কোরতেন ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসরণ কোরে; আর ধর্মই তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছিল। পরবর্তীতে ভারত উপমহাদেশে এসলামের প্রবেশ ঘটে। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের প্রতি এসলামের নীতি উদার হওয়ায় জাতির ঐক্য বিনষ্ট হয়নি। যেহেতু জোর জবরদস্তিতে এসলাম বিশ্বাস করে না সেহেতু স্বপ্রণোদিত হোয়ে কেউ এসলাম গ্রহণ না করলে কাউকে বাধ্য করা হয়নি। তাই সে সময় কোন রায়টের ঘটনাও ঘটেনি। মানুষ নির্বিঘ্নে তাদের ধর্মকর্ম পরিচালনা কোরেছে, ঐক্যবদ্ধভাবে জাতির সকল কাজে আত্মনিয়োগ কোরে জাতিকে সমুন্নত কোরে রাখার চেষ্টা কোরেছে। কাল পরিক্রমায় ধন সম্পদে পূর্ণ এই জাতির দিকে লোলুপ দৃষ্টি পড়ে পশ্চিমা দেশগুলির। ওলন্দাজ, ডাচ, ইংরেজরা একসময় অত্র এলাকা দখল কোরে তাদের জোর জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থায় এদেশ শাসন কোরতে থাকে। তাদের আগমন শুধুই ছিল সম্পদ অর্জনের জন্য, সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য। সুতরাং তারা তাদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যা যা করণীয় তাই কোরেছে, সেটা যত জঘন্যই হোক না কেন। তথাপিও জাতির ঐক্যের দৃঢ় বন্ধনের কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে এদেশ শাসন কোরতে তাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হোয়েছে। তাদের বিভিন্ন আন্দোলন, বিদ্রোহের মুখে পড়তে হোয়েছে। এ কারণে ভারত উপমহাদেশ শাসন কোরতে শুরু থেকেই তাদেরকে নানা কূট কৌশল অবলম্বন কোরতে হোয়েছে। সেই কূট- কৌশলের প্রধান পদক্ষেপ হোল এ জাতির ঐক্যকে নষ্ট করে দেওয়া। সেজন্য তারা নানান ঘটনা ঘটিয়ে হিন্দু-মোসলেম-বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মীয় বিবাদ সৃষ্টি কোরিয়ে রায়টের মতো ঘটনাও ঘটাতে কুণ্ঠিত হয়নি। দুনিয়াবি সম্পদ আহরণ ও ভোগ যখন মুখ্য হোয়ে দাঁড়ায় তখন আর কোন মানবিকতা থাকে না। তাই তারা অমানবিকভাবে এদেশের সকল সম্পদ লুট কোরে জাহাজ ভর্তি কোরে তাদের দেশে নিয়ে গেছে। অপর দিকে অনাহার অর্ধাহারে এই সোনার দেশের মানুষগুলোকে দাসত্বের, গোলামীর জীবন যাপন কোরতে বাধ্য কোরেছে। তারপর প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন তাদের শক্তি ক্ষয় হোয়ে গেলো তখন এ উপমহাদেশ প্রত্যক্ষভাবে শাসন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হোয়ে পড়লো। কিন্তু এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, সম্পদের মোহ তাদের কাটেনি। তাই তারা চোলে যাওয়ার আগে এমন ব্যবস্থা কোরে গেলো যেন– আমরা নিজ থেকেই আমাদের মধ্যে অনৈক্য, বিবাদ, বিসম্বাদ ধরে রাখি আর তারা এসে মীমাংসা কোরুক, তারা প্রভু হয়েই থাকুক। তারা এমন এক ব্যবস্থা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে গেলো যেন- এ উপমহাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, সম্পদ আমরা নিজ থেকেই তাদের হাতে তুলে দিয়ে আসি। তাই তারা তাদের চক্রান্তকে বাস্তবায়নের জন্য ভারতকে বিভক্ত করে গণতন্ত্র নামক একটি ঐক্যহীন জীবনব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে গেল। এই পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদের রীতিনীতি, সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় আজও আমরা তার কোন সুফল পায় নি। বরং জাতির ঐক্য আরো ভেঙ্গে খানখান কোরে দিয়েছে। দল উপদলে বিভক্ত হোয়ে আজ শতশত মতাদর্শে এ জাতি ঐক্যহীন। পাশ্চাত্যের অনুসরণ কোরতে গিয়ে এই ঐক্যহীনতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে পারিবারিক ক্ষেত্রেও আমরা শেষ পর্যন্ত ঐক্য ধরে রাখতে পারিনি। যৌথ পরিবার প্রথা এখন বিলুপ্ত, পিতা-মাতা-সন্তান আজ মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও ঐক্যহীনতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ধারাবাহিকভাবে বিচ্ছেদ লেগেই আছে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে ঐক্যহীন এক লাখ লোক একশত ঐক্যবদ্ধ লোকের সামনে খড়কুটোর মতো। শাপলা চত্বরের ঘটনাই এর প্রমাণ। জনগণের এই ঐক্যহীনতার কারণে আমরা মাত্র কয়েকটি রাজনৈতিক দলের কাছে জিম্মি হোয়ে পড়েছি। আজ বড় লাটেরা চোলে গেছে ঠিকই কিন্তু তাদের প্রতিভূ রাজনৈতিক দলগুলো তাদের শেখানো পদ্ধতিতে জনগণের নামেই জনগণকে পুড়িয়ে মারছে, গুলি কোরে মারছে, বোমা ফাটিয়ে মারছে। আর আমরা অবোধ গৃহপালিত পশুর মতো নির্বিবাদে মার খেয়ে যাচ্ছি। ঐক্যহীনতাই আজ আমাদের কাল হোয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জাতি ক্ষয় হোতে হোতে একেবারে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে ঐক্যহীনতার কারণে। তাই জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হোলে যে সর্বোত্তম পন্থায় সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো ঐক্যবদ্ধ একটি জাতিতে রূপান্তর হওয়া যায় আমাদের সেই পন্থার দিকে অগ্রসর হওয়া উচিৎ। ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি শান্তিময় পৃথিবী বিনির্মাণে আর কোন বিকল্প পথ নেই। □

নেতা পরিবর্তনের চাইতে সিস্টেম পরিবর্তন জরুরি

পৃথিবীর ইতিহাসে বর্তমান সময় সবচাইতে বেশি অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন, খুন, ধর্ষণ, যুদ্ধ, সর্বপ্রকার ভেজাল ও মিথ্যা এবং সর্বোপরি পারমাণবিক যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। এই অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য আমরা চেষ্টা-প্রচেষ্টাও কম করছি না। যারা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন তারা দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এই অন্যায়, অশান্তি ও অবিচার থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে। যারা রাজনীতির সাথে জড়িত আছেন, রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন তারাও চেষ্টা প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। সকল ধর্মের অনুসারীরা মসজিদ, মন্দির, চার্চ, প্যাগোডা ও সিনাগগে গিয়ে শান্তির জন্য প্রার্থনা করছেন। কিন্তু এতকিছুর পরও আমরা এই অশান্তি থেকে মুক্ত হোতে পারছি না। বরং দিন দিন এ অবস্থার ক্রমাবনতি হচ্ছে। এত কিছুর পরও, এত চেষ্টা প্রচেষ্টা করেও কেন আমরা কিছুতেই এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাচ্ছি না? আসলে কোন রাস্তা যখন বাঁকা হয় তখন কেউ চাইলেই সে রাস্তায় গাড়ি সোজাভাবে চালাতে পারে না। বাঁকা রাস্তায় চলতে গেলে তাকে আঁকাবাঁকা হয়েই চলতে হয়। শত ইচ্ছা থাকলেও বাঁকা রাস্তায় গাড়ি সোজা করে চালানো যায় না। বরং তা করতে গেলেই দুর্ঘটনা ঘটতে বাধ্য। অন্যদিকে রাস্তা যখন সোজা থাকবে তখন চালককে গাড়ি সোজা করেই চালাতে হবে। চাইলেও সে গাড়ি আঁকাবাঁকাভাবে চালাতে পারবে না। বাঁকা চালাতে গেলেই সে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসবে। বর্তমানে আমাদের সমাজের অবস্থা ঠিক তাই দাঁড়িয়েছে। আজকে আমরা বাঁকা পথে চলছি। এই সমাজ ব্যবস্থায় যারা রাজনীতিতে আসছেন, সমাজ ও দেশের উন্নতি করতেই আসছেন। কিন্তু সিস্টেমের কারণে এক সময় তারা দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। যারা সরকারি চাকুরিতে যোগ দেন, তারাও দেশ ও জনগণের সেবার মানসিকতা নিয়ে চাকুরিতে যোগ দেন। কিন্তু পরিস্থিতি অর্থাৎ সিস্টেমের কবলে পড়ে তারাও দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। এমনি করে এই সমাজ ব্যবস্থা আমাদেরকে বাধ্য করছে অন্যায়ের সাথে, জুলুমের সাথে, দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়তে। তাই এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এই সমাজব্যবস্থা, এই সিস্টেমে পরিবর্তন আনার, যে সিস্টেম চাইলেও মানুষকে সৎ থাকতে দেয় না, একজন ব্যবসায়ীকে চাইলেও সৎভাবে ব্যবসা করতে দেয় না, চাইলেও একজন রাজনীতিবিদকে সৎ থাকতে দেয় না, সেই সিস্টেম আমাদেরকে অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। আমাদেরকে এমন এক সিস্টেম বাস্তবায়ন করতে হবে, যে সিস্টেমে কেউ চাইলেও অন্যায় করতে পারবে না, কোন ব্যবসায়ী চাইলেও অসৎ হোতে পারবে না, খাদ্যে ভেজাল মেশাতে পারবে না, একজন মানুষ চাইলেও সুদ, ঘুষ, চুরির সাথে নিজেকে জড়াতে পারবে না। এমন একটি সিস্টেম আমরা কোথায় পাব, এমন একটি সিস্টেম আমাদেরকে কে দেবেন? অনন্য সেই সিস্টেমটিই মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছেন যামানার এমাম, এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি এমন এক সিস্টেম আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যে সিস্টেম গ্রহণ করলে মানবজাতি শান্তি ও সমৃদ্ধিতে বসবাস করতে সক্ষম হবে। এই মহামানবের পক্ষ হয়ে আমরা সেই সিস্টেমের কথাই বলছি যে সিস্টেম বাস্তবায়িত হলে মানুষ পাবে ন্যায় ও সুবিচার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা। এমন নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে যে একা একজন সুন্দরী যুবতী নারী অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় মাইলের পর মাইল হেঁটে যাবে, একমাত্র আল্লাহ ও বন্যপ্রাণীর ভয় ছাড়া তার আর কোন ভয় থাকবে না। আমরা এমন এক সিস্টেমের কথা বলছি যা মানুষ গ্রহণ করে নিলে সামাজিক অপরাধ এমন পর্যায়ে নেমে আসবে যে বছরের পর বছর ধরে আদালতে অপরাধ সংক্রান্ত কোন মামলা আসবে না। আপনারা হয়তো বলবেন এ এক স্বপ্নের ব্যাপার, অলীক কল্পনা। কিন্তু আমরা বলবো- না, এটা স্বপ্ন নয়, কল্পনাও নয়। এটাই ছিলো মোসলেম জাতির সত্যিকার ইতিহাস। আজকে আমাদেরকে এই ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা ভুলে গেছি আমাদের সত্য ইতিহাস কি? একসময় আমরা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জাতি ছিলাম। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-দীক্ষায়, নতুন নতুন আবিষ্কার ও অভিযানে, অর্থনীতি ও সামরিক শক্তিতে আমরা ছিলাম পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জাতি। কিন্তু সেই জাতি আজ পৃথিবীতে অন্যান্য জাতির গোলামে পরিণত হয়েছে। ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের সেই শ্রেষ্ঠত্বের ইতিহাস। আমাদের সেই সোনালী অতীতের কথা ভুলে গিয়ে এখন আমরা সমাজের সমস্ত অন্যায় অবিচার মুখ বুজে মেনে নিয়েছি। মনে হয় যেন এর বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই করার নেই। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য আল্লাহ আমাদেরকে একটি পথ দিয়েছেন, একটি জীবন বিধান দিয়েছেন যা কায়েম করলে আমরা এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাব। সেই পথটি হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে আল্লাহ বুঝিয়ে দিয়েছেন। নেতৃত্ব কোন সমস্যা নয়। সমস্যা সিস্টেমের মধ্যে। তাই জরুরি হচ্ছে সিস্টেম পরিবর্তন করুন। আজকে যারা সমাজের নেতৃত্বে আছেন তারাই পরিবর্তিত দুনিয়ায় নেতৃত্বে থাকবেন, যদি তারা সেই সিস্টেমকে গ্রহণ করে নেন। আরবের জাহেলিয়াতের যুগে যারা সমাজের সবচাইতে খারাপ লোক ছিল, দুস্কৃতিকারী ছিলো আল্লাহর দেওয়া সিস্টেম গ্রহণ করার ফলে তারাই পরিবর্তিত হয়ে একেকজন সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। তাদের নাম উচ্চারণ করলে আমরা এখন রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট এবং আল্লাহও তাঁদের উপর সন্তুষ্ট বলে থাকি। সুতরাং বর্তমানের এই সিস্টেম পরিবর্তন করে যে সিস্টেম জাহেলিয়াতের অন্ধকারে থাকা পঙ্কিল মানুষগুলোকে সম্মানীত করেছে, দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা লাভ করেছেন আমরা সেই সিস্টেম কায়েম করার কথা বলছি। তাই সিস্টেম পরিবর্তনে আমাদের কোন ভয় নেই। বরং এতেই রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা লাভের উপায়। তাই আসুন আমরা সেই সিস্টেমকে গ্রহণ করি, বর্তমানের এই অশান্তিময় সিস্টেম পরিবর্তন করি। □

১৬ কোটি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হবো কেন?

১. সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, অশান্তি থেকে বাঁচার জন্য।

২. রাজনৈতিক দলাদলি, হানাহানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য।

৩. ধর্মব্যবসা, ধর্ম নিয়ে অপ-রাজনীতি থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য।

৪. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হিংস্র থাবা থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য।

৫. বৈদেশিক পরাশক্তির তাবেদারি করা থেকে জাতিকে উদ্ধার করার জন্য।

৬. বিশ্বের বুকে মর্যাদাবান একটি পরাশক্তিধর জাতি হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য।

৭. জাতির সামগ্রিক উন্নতি, প্রগতি, সমৃদ্ধির জন্য।

৮. আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি বাসযোগ্য পরিবেশ ও নিরাপদ জীবন উপহার দেওয়ার জন্য।

শাহানা পন্নী

ঔপনিবেশিক আমল থেকে বর্তমান শিক্ষা একটাই: দরকার জাতীয় ঐক্য

দীর্ঘ দু'শো বছর যে ঔপনিবেশিক শক্তিটি দাপটের সাথে বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি অঞ্চল শাসন করলো, বলা হয়ে থাকে যে তারা এতদঞ্চলের মানুষদের চাপের মুখে বিতাড়িত হয়েছে। বাস্তবতা হচ্ছে এটা আংশিক সত্য মাত্র। মূলত এরা নিজেরা নিজেরা গত শতাব্দীতে দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ করে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে তাদের অধীনস্থ অঞ্চলগুলোতে তাদের শাসনের ব্যাপারে মানুষ বিদ্রোহীও হয়ে উঠেছিল। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যে শক্তিটি অর্ধ-দুনিয়া শাসন করলো তারা অবশ্যই সর্বদিক দিয়ে সচেতন একটি জাতি। তাই তারা আগাম বুঝতে পেরেছিল তাদের ঔপনিবেশিক আমল শেষের দিকে। হয়তো এসব অঞ্চলকে আর বেশি দিন এভাবে দাবিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু ঐ সময়ের জন্য এটাও বাস্তব ছিল যে, তারা যদি চাইতো তাহলে জোর করে আরো বেশ কিছুটা সময় শাসন করতে পারতো। কিন্তু বুদ্ধিমত্তায় এগিয়ে থাকায় এই শক্তিটি আপসে এদেশীয় জনতার একটি অংশের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা দিয়ে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে আলগোছে সরে পড়ে। তারা জানতো শতাব্দীর পর শতাব্দী এইভাবে মানুষকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। একদিন না একদিন তাদেরকে এই সব অঞ্চল থেকে বিদায় নিতেই হবে। তাই তারা নিজেদের স্বার্থ কায়েম রাখার জন্য একটি শয়তানি ফন্দি করলো।

প্রথমত তারা ঐ সময়ের সকল শিক্ষাব্যবস্থা বন্ধ করে দিল এবং দুইটি ধারায় শিক্ষাব্যবস্থা চালু করলো। এর একটি অংশ ধর্মীয় অংশ এবং অন্যটি সাধারণ শিক্ষা। উপমহাদেশের বড়লাট লর্ড ওয়ারেন হেসটিংস ১৭৮০ সনে ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কোলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরল। এই মাদ্রাসায় এসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য খ্রিস্টান পন্ডিতরা বহু গবেষণা কোরে একটি নতুন এসলাম দাঁড় করালেন যে এসলামের বাহ্যিক দৃশ্য প্রকৃত এসলামের মতই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটার আকীদা এবং চলার পথ আল্লাহর রসুলের এসলামের ঠিক বিপরীত।

এই শিক্ষা ব্যবস্থার সিলেবাসে অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদির কোনো কিছুই রাখা হোল না, যেন মাদ্রাসা থেকে বের হোয়ে এসে আলেমদের রুজি-রোজগার কোরে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য এই দীন, ধর্ম বিক্রি কোরে রোজগার করা ছাড়া আর কোন পথ না থাকে। খ্রিস্টানরা এটা এই উদ্দেশ্যে কোরলো যে তাদের মাদ্রাসায় শিক্ষিত এই মানুষগুলো যাতে বাধ্য হয় দীন বিক্রি করে উপার্জন কোরতে এবং তাদের ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে বিকৃত এসলামটা এই জনগোষ্ঠির মন-মগজে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হোয়ে যায়। খ্রিস্টানরা তাদের এই পরিকল্পনায় শতভাগ সাফল্য লাভ কোরলো। এই মাদ্রাসা প্রকল্পের মাধ্যমে দীনব্যবসা ব্যাপক বিস্তার লাভ কোরল এবং এর মাধ্যমে মোসলেমদের মধ্যেও অন্যান্য ধর্মের মত একটি স্বতন্ত্র পুরোহিত শ্রেণি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ কোরল। তারা দীনের বহু বিতর্কিত বিষয় নিয়ে তর্ক-বাহাশ এবং ফলশ্রুতিতে বিভেদ-অনৈক্যের সৃষ্টি কোরতে থাকলো, যার দরুন জাতি খ্রিস্টান প্রভুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শক্তি হারিয়ে ফেলল। এই পুরোহিত শ্রেণির কর্মকাণ্ডের ফলে তাদেরকে অনুসরণকারী বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠির চরিত্র প্রকৃতপক্ষেই পরাধীন দাস জাতির **চরিত্রে পরিণত হোল, কোনদিন তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার চিন্তা করারও শক্তি রোইল না। ফলে তারা চিরতরে নৈতিক মেরুদণ্ড হারিয়ে ফেলে সমাজের উচ্চ শ্রেণির মুখাপেক্ষি হোয়ে রোইলো।**

এভাবেই খ্রিস্টান পন্ডিতরা নিজেরা অধ্যক্ষ থেকে ১৯২৭ সন পর্যন্ত ১৪৬ বছর ধোরে এই মোসলেম জাতিকে এই বিকৃত এসলাম শেখালো। অতপর তারা যখন নিশ্চিত হোল যে, তাদের তৈরি করা **বিকৃত এসলামটা তারা এ জাতির হাড়-মজ্জায় ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হোয়েছে এবং আর তারা কখনও এটা থেকে বের হোতে পারবে না তখন তারা ১৯২৭ সনে তাদের আলীয়া মাদ্রাসা থেকেই শিক্ষিত মওলানা শামসুল ওলামা কামাল উদ্দিন আহমেদ (এম.এ.আই.আই.এস) এর কাছে অধ্যক্ষ পদটি ছেড়ে দিলো** (আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, মূল- আঃ সাত্তার, অনুবাদ- মোস্তফা হারুণ, ইসলামী ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal" by Dr. Sekander Ali Ibrahimy (Islami Faundation Bangladesh), মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

অপরদিকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত অংশটিতে এই বিরাট এলাকা শাসন কোরতে যে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের কেরাণীর কাজ করার জনশক্তি প্রয়োজন সেই উপযুক্ত জনশক্তি তৈরি করার বন্দোবস্ত করা হোল। তারা

এতে ইংরেজি ভাষা, সুদভিত্তিক অংক, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক, প্রযুক্তিবিদ্যা অর্থাৎ পার্থিব জীবনে যা যা প্রয়োজন হয় তা শেখানোর বন্দোবস্ত রাখলো। এখানে আল্লাহ, রসুল, আখেরাত ও দীন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই রাখা হোল না। এসলামের গৌরবময় ইতিহাসের পরিবর্তে ইউরোপ-আমেরিকার রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস, তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কাহিনীই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোল। ফলে এই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণিটি মনে-প্রাণে প্রভুদের সম্বন্ধে একধরনের ভক্তি ও নিজেদের অতীত সম্বন্ধে হীনমন্যতায় ভুগতে লাগলো। বাস্তবতা এমন দাঁড়ালো যে তারা নিজেদের প্রপিতামহের নাম বলতে না পারলেও ইউরোপীয় শাসক, কবি, সাহিত্যিকদের তস্য-তস্য পিতাদের নামও মুখস্ত করে ফেললো। নিজেদের সোনালী অতীত ভুলে যাওয়ায় তাদের অস্থিমজ্জায় এটা প্রবেশ করলো যে সর্বদিক দিয়ে প্রভুরাই শ্রেষ্ঠ।

এই দুই অংশের বাইরে বাকী ছিল উভয়প্রকার শিক্ষাবঞ্চিত এক বিশাল জনসংখ্যা। এখন যখন প্রভুদের এদেশ ছেড়ে যাবার সময় হলো তখন তারা কাদের হাতে শাসনভার ছেড়ে যাবে তা নিয়ে মোটেও তাদের চিন্তা করতে হলো না। একে তো মাদ্রাসা শিক্ষিত শ্রেণিটি শাসন করার যোগ্য নয়, এমনকি শাসন করার ব্যাপারে আগ্রহীও নয় (বর্তমানেও এদের উত্তরসূরিদের একটা অংশ তাই মনে করে। এরা মনে করে শাসন যে-ই করুক, আমরা ধর্ম-কর্ম করতে পারলেই চলবে), আর সাধারণ মূর্খ জনতার হাতে শাসনদণ্ড ছাড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই অবশ্যই বাকী থাকে সাধারণ শিক্ষিত অংশটি। এদের হাতে শাসনভার ছেড়ে যাওয়ার লাভ বহুমুখী। একে তো তারা প্রভু বলতে অজ্ঞান, তাছাড়া প্রভুরা না থাকলেও তারা যে প্রভুদের স্বার্থই রক্ষা করে চলবে এ ব্যাপারে প্রভুরা একেবারেই নিশ্চিত ছিলেন।

এরাই যে প্রভুদের অনুপস্থিতিতে শাসনভার পাওয়ার অধিকারী এবং পাশ্চাত্য প্রভুরা আগে থেকেই তাদের জন্য এ ব্যাপারে প্রশিক্ষিত করে তুলেছে তার একটি বড় প্রমাণ তাদেরকে অধিকার আদায়ের পথ শিক্ষা দেওয়ার নামে তাদের পছন্দসই রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া। এই প্রভুদেরই একজন, এলান অক্টাভিয়ান হিউম (Allan Octavian Hume. 1829-1912) নামে কথিত 'ভারতপ্রেমী' ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস (Indian National Congress) নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে এদেশীয় শিক্ষিত শ্রেণিটিকে এদেশীয়দের অধিকার আদায়ের রাজনীতি শিক্ষা প্রদান করেন। অবাক করা ব্যাপার এই যে তিনি তাদের কাছে 'ভারতপ্রেমী' নামে পরিচিত। তারই শিক্ষায় শিক্ষিত এই রাজনীতিকরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রভুদের পছন্দসই রাজনীতি শিক্ষা লাভ করেছেন। বর্তমানে আমাদের দেশের সাধারণ জনগণের ঘৃণা কুড়ানো রাজনীতিকরা তাদেরই বর্তমান উত্তরসূরি।

কাল অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু আমাদের প্রতি প্রভুদের পূর্ব মানসিকতা এখনো যায় নি। আমাদের সম্পদ থেকে ভাগ নেওয়ার মানসিকতাও এখন পর্যন্ত তাদের দূর হয় নি। ঐ সময়ে নিয়েছে জোর করে আর এখন নেয় নেতা-নেত্রীদেরকে ক্ষমতা বসিয়ে দেওয়ার নামে আঁতাত করে। যারা তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তারাই তাদের আনুকূল্য পায়। আর এই আনুকূল্যের রসদ হচ্ছে আমাদের নেতাদের বিভিন্ন দাসত্ব চুক্তি, দাসখত।

যাই হোক, গোলামি যুগে প্রভুরা আমাদেরকে যে রাজনীতি শিক্ষা দিয়ে গেছেন আমরা নির্দ্বিধায় আজও তা চর্চা করে যাচ্ছি। এর উপমা এই যে, জেল-পুলিশ জেল গেট খুলে চলে গেছে, কিন্তু কয়েদীরা এতই ভাল কয়েদী যে তারা জেল থেকে বের না হয়ে তাদের মধ্য থেকেই অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী লোকদেরকে পুলিশ বানিয়ে মনোযোগের সাথে জেল খাটা অব্যাহত রাখলো। কোন কোন সচেতন কয়েদী তাদের এই দুরবস্থা দেখে এই জেল থেকে বের হওয়ার কথা বললে বরং তারা কয়েদীকে অবাধ্য ও বিদ্রোহী বলে মারতে লাগলো।

তাদের শেখানো রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের মাধ্যম অর্থাৎ 'গণতন্ত্র' আসলে কি এ সম্বন্ধে এবার জানা যাক। গণতন্ত্র এমন একটি জীবনব্যবস্থা যার গোড়াতেই অনৈক্যের বীজ রোপণ করা। বহুদল, বহুমত হচ্ছে এর অন্যতম প্রধান উপাদান। যে যা খুশি বলবে, যে যা খুশি করবে, দাবী আদায়ের নামে মানুষের পথ চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, গাড়ি পোড়াবে, রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতিসাধন করবে, জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে মারবে, পিটিয়ে মারবে, এই জাতীয় সকল কার্যক্রম গণতন্ত্র দ্বারা সিদ্ধ। এই সব কার্যক্রম যারা চালিয়ে যাবে তাদেরকে বলা হয় নিয়মতান্ত্রিক দল। এসব যারা করে না তারা অগণতান্ত্রিক, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই পরিত্যাজ্য। গণতন্ত্রে যত দল সৃষ্টি হবে তত নাকি গণতন্ত্র বিকশিত হয়। মূলতঃ গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তিতেই অনৈক্য প্রোথিত হয়ে আছে। আর এটা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম যে ঐক্যই সমৃদ্ধি আর অনৈক্য ডেকে আনে ধ্বংস। বাস্তবতা হচ্ছে গণতন্ত্র এমন একটি ব্যবস্থা যা একমাত্র গোলামদের জন্যই প্রযোজ্য, অনুগত দাসদের বিদ্রোহ করার পরিবর্তে গোলামীতে ব্যস্ত রাখতে এটি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এ জন্যই এটি সাম্রাজ্যবাদীরা বার বার তাদের কাঙ্ক্ষিত ভূ-খণ্ডে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

গণতন্ত্রের এই সব বৈধ কার্যক্রম চর্চা করতে করতে পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ৪২ বছর পর নানা উত্থান-পতনের মাধ্যমে এই জাতিটি আজ চূড়ান্ত গহ্বরে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাই প্রভুরা আবারো ফিরে আসছেন স্ব-মূর্তিতে, প্রেমিকের বেশে। সবাইকে নিয়ে বসিয়ে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য একের পর এক জোরালো মিশন চলছে। জোর করে ঔষধ গেলানোয় রোগী তা বমি করে উগরে দিচ্ছে, তাই আমাদের প্রভুরা বিশেষ ব্যবস্থায় তা গলধঃকরণ করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছেন।

প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এর বিকল্প কি?

এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, এর বিকল্প হচ্ছে আমাদেরকে একতাবদ্ধ হোতে হবে। এদেশ আমাদের, সুতরাং এদেশ কিভাবে চলবে, কোন জীবনব্যবস্থা এদেশের মানুষ গ্রহণ করবে তা একান্তই আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। আমাদেরকে সর্বপ্রথম নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান বিভেদ দূর করতে হবে। সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, আমরা বিদেশী মগজ দিয়ে চিন্তা করবো না। এদেশের মাটি ও মানুষ যে স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে জীবন ধারণ করে আসছিল তার মধ্যে যে অংশটুকু আমাদের ভুল ছিল তা খুঁজে বের করে অর্থাৎ ঐ ভুল শুধরিয়ে আমাদেরকে সামনে এগোতে হবে। এই দেশ বহুকাল আগে থেকেই ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছিল। তখন এই উপমহাদেশীয় অঞ্চলটিতে দুইটি প্রধান ধর্ম পাশাপাশি অবস্থান করলেও মানুষ সুখ, সমৃদ্ধি, ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে দিনাতিপাত করে আসছিল। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব এদেশে ঔপনিবেশিক আমলের আগে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে ব্রিটিশদের এদেশ দখল করার পর থেকেই। কারণ, তাদের মূল নীতিই ছিল 'ভাগ করো এবং শাসন করো'। এদেশীয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘাত লাগিয়ে তারা নিশ্চিন্তে তাদের শাসনদণ্ড আমাদের উপর ঘুরিয়ে গেছে। তাই বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বর্তমান চলমান সঙ্কটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রথম কাজ হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। ১৯৭১ সালে শেষবার বাঙ্গালী জাতি পাকিস্তানিদের দুঃশাসনের হাত থেকে মুক্তির জন্য একতাবদ্ধ হয়েছিল। আজ সে ঐক্যের বড় অভাব। জাতির এখন প্রয়োজন সকল বিভেদ-ব্যবধান ভুলে এক কাতারে দাঁড়ানো, সেই ঐক্যকে ফিরিয়ে আনা। তাহলেই একমাত্র আমাদের দ্বারা সম্ভব পৃথিবীর বুকে আত্ম-মর্যাদাসম্পন্নভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো একটি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া। □

মানবতার কল্যাণে সত্যের প্রকাশ
সৌজন্যে: দৈনিক দেশেরপত্র
১৯৫২ ভাষা আন্দোলন
১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থান
১৯৭০ নির্বাচন এবং ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধে
ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এই জাতি।
৪২ বছর পর জাতির ক্রান্তিলগ্নে
আবারো ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এখনই সময়।
এক জাতি, এক দেশ
ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ
এক জাতি এক দেশ
ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ
DVD
মানবতার কল্যাণে সত্যের প্রকাশ
দৈনিক দেশেরপত্র
যোগাযোগ: ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫ www.desherpatro.com
web: www.desherpatro.com
ডকুমেন্টারি ভিসিডি/ডিভিডি সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করুন:
০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৭১১০০৫০২৫ অথবা ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫